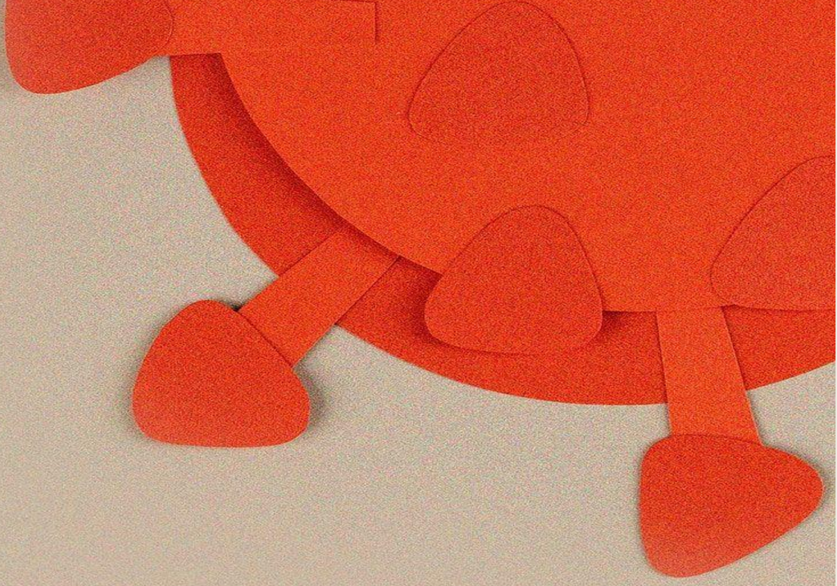
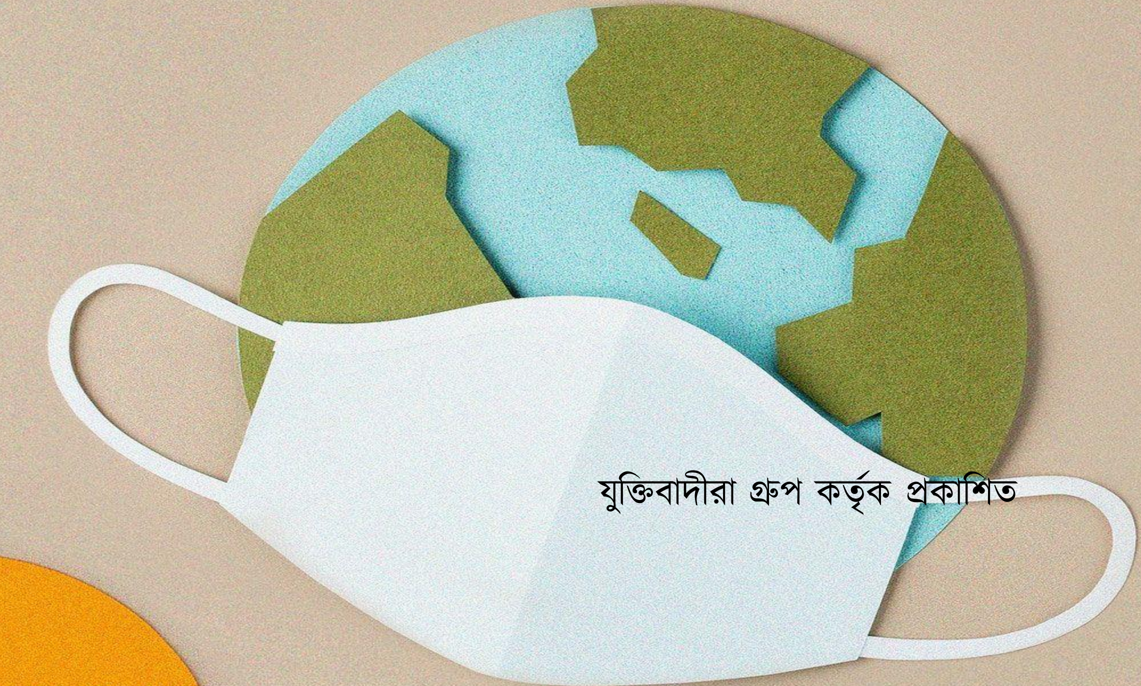


চেতনা

এপ্রিল সংখ্যা, ২০২১



যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **'চেতনা'** এপ্রিল সংখ্যা, ২০২১

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ত্রিশ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

কবিতা

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে অবিশ্রান্ত চোখে না পড়ার মতোই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে, আর তার প্রভাব এই তুচ্ছ মানব প্রজাতিতে সদ্য প্রেমে পড়া যুবকের কবিতা হয়ে ধরা দেয় তো ভাপসা গরমে সিগন্যালে আটকে যাওয়া ভীড় ট্রেনে টাঁক মাথা জেঠুর তীব্র বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্লাটারফ্লাই এফেক্টের প্রজাপতির ঝাপটা নিশ্চয় প্রভাব ফেলেছিল আমাদেরও।

তাই যুক্তিবাদী-মুক্তচিন্তক ব্যক্তিত্বদের জন্য একটি ম্যাগাজিন খোলা হলো। সাহিত্যের প্যারামিটারে লেখাটি পাঠমধুর কিনা, কিংবা লেখাতে শব্দের বিন্যাস কতখানি সুশৃঙ্খল, এসবের একদমই তোয়াক্কা না করে চাঁচাছোলা যেমনটি সম্ভব, যতগুলো বাক্যে পারবেন লিখতে বলা হলো। এবং এর প্রভাবও পড়লো অত্যাশ্চর্যভাবে। পাঠ-প্রতিক্রিয়া দিলেন অনেকেই, খোলা হলো পোর্টাল।

এই ডিস্টোপিয়ান অসহনীয় সময়গুলোতেও লেখনী চালিয়ে যাওয়ার মতো ধীশক্তি ধরে রেখে যুক্তিবাদীরা নিরন্তর লিখে চলেছেল। বিকিয়ে যাওয়া কর্দমাক্ত সমাজে সমস্ত বাধাকে চুরমার করে রাষ্ট্র-ধর্ম সর্বপরি সমাজকে আঙুল দিয়ে আজও দেখিয়ে দিচ্ছে দেখে বড় আশান্বিত হওয়া ছাড়া উপায় ছাড়া উপায় কি? যেনো টার্ডিগ্রেডের মতো তারা নিজের অস্তিত্ত জানান দিয়ে বলে চলেছেন আমরা আছি, আমরা থাকবো।

যুক্তির হারিকেনের শনশন ঝাপটার উদ্ভব কি জানি কোন্ প্রজাপতির ডানায় চেপে মনুষ্য দুয়ারে এসে পৌঁছেছিল। সেই ঝাপটার অংশ হতে চেয়ে কোন এক বালিকনাসম প্রয়াসের ফল 'চেতনা' নয় কি?

লকডাউনের নাটক ও আমরা

-স্বর্ণাভ ভট্টাচার্য

লকডাউনে জনজীবন বিপন্ন হওয়ার ছবি আমরা সবাই দেখেছি, সেটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরে আসার চেষ্টায় মৃত্যুর স্মৃতি এখনো তাজা।

দেখা যাক, রাজনীতি কীভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তার নমুনা। কীভাবে সংক্রামক রোগটিকে (যার মৃত্যুহার ভারতে ১.১৮%, পশ্চিমবঙ্গে ১.৫৯%, তবে সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়) নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে ও হচ্ছে। সূত্র: https://g.co/kgs/T3CrVZ

হঠাৎ কেন করা হলো লকডাউন? ২০১৯ সালের শেষের দিকে CAA, NRC, NPR বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার নিয়েছিল। বিভিন্ন গণ সংগঠনগুলি দিন রাত এক করে মিছিল, সমাবেশ করে জনমত সংগ্রহ করছিল, সরকার চাপে পরছিল। এই সময়ে সরকারের দরকার ছিল সবকিছু থামিয়ে দেওয়ার মতো ব্রহ্মাস্ত্র, এই ধারাবাহিক আন্দোলনের শৃঙ্খলটাকে ভেঙে দেওয়ার।

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে করোনায় আক্রান্তের খবর আসতে থাকে। ২৭ শে জানুয়ারি ভারতের প্রথম করোনা আক্রান্তের কথা জানাজানি হয় (কেরলের ২০ বছর বয়সী একজন মহিলা)। তার আগে থেকেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল, বা বলা যায় ছড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রোগ কিছুটা ছড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা হয়েছে। তারপর হঠাৎ কোনোরকম পূর্ব অবগতি ছাড়াই ২৫ শে মার্চ দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এর ফলে বাইরে বেরোনো সমস্যার হয়ে গেলো। যে মানুষটার 'দিন আনা দিন খাওয়া', যে মানুষটা দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কাজ করে, তার বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেওয়া হলো। কারখানাগুলোয় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয় ন্যূনতম ভর্তুকি না দিয়ে। দেশের নানা প্রান্তের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'পরিযায়ী শ্রমিক'দের দুর্বিষহ জীবন। বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু, পুলিশের লাঠি।



আর এসবের মূল লক্ষ্য, পরোক্ষভাবে NRC, CAA, NPR জাতীয় অপ-আইনের বিরোধীতামূলক আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে দমন করা। আর তা করা হয়েওছে। এই আন্দোলনহীন সময়ে (আন্দোলন হলেও লকডাউনের জন্য যা ডিজিটাল ভাবে হয়েছে, ব্যাপ্তি পায়নি বা আটকে দেওয়া হয়েছে) অনেকগুলো জনস্বার্থ বিরোধী বিল পাস করা হয়।

এর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২৯ শে জুলাই, ২০২০ তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে পাস হয়। এই আইন চালু হলে শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণের পথে এগোবে। এরপর, আনলককে পুনরায় নিয়মমাফিক জীবনে অভ্যস্ত হতে মানুষের সময় লেগেছে। আর সেই সময়েই ২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ লোকসভা ও তার পরের দিন রাজ্যসভায় পাস হয়ে যায় The Industrial Relations Code, 2020. যার ফলে মালিক পক্ষের হাতে সরকার তুলে দেয়, ইচ্ছামত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার। যার জন্য কাজ হারায় অনেক শ্রমিক।

এই সময় তিনটি কৃষি বিল উপস্থাপনা করা হয়, কর্পোরেট দালালদের সুবিধার্থে, কৃষকদের সাথে আলোচনা না করেই। যাদের গালভরা নাম —

১) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 (চাল, ডাল, আটা, আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি ২০টির বেশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে বাদ গেল। এছাড়া, কোনো সংস্থার পক্ষে এই সমস্ত পণ্য মজুতির সর্বোচ্চ সীমা রইল না। ফলে যে কেউ অত্যধিকহারে উক্ত পণ্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে পারে ও বেশি দামে তা বিক্রয় করতে পারে, এক্ষেত্রে সরকারকে জবাবদিহির বাধ্য থাকলো না সে বা তারা।)

২) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 (নীলকর সাহেবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কৃষকদের দুর্গতির কথা আমরা সবাই জানি, এটা তারই আধুনিক রূপ। কোনো কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর, চুক্তি অনুযায়ী ফসল উৎপন্ন না হলে বা উৎপন্ন ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কৃষকের আর্থিক ক্ষতির দায় নিতে কোম্পানি বাধ্য থাকবে না।),

৩) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 (ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি নিজেরা সরাসরি কৃষকদের থেকে ফসল কিনতে পারবে। ফলে, পূর্বের স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষকদের জন্য খরচের দেড় গুণ দামে বিক্রয়মূল্য সংক্রান্ত সুনিশ্চিতকরণের দায় সরকারের রইল না।)

এই মারণ বিলের বিরোধিতায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা ৯ই আগস্ট, ২০২০ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের রাস্তা নেন। পরে অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকরা এতে যোগ দেন। তাঁরা দিল্লির সিংঘু ও টিকরী বর্ডারে বর্তমানে বিক্ষোভরত। কিন্তু লকডাউন ও তৎপরবর্তী আনলকের ফলে বেশিরভাগ অঞ্চলে এই আন্দোলন নৈতিক সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি। এরই মধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর ও ২০ শে সেপ্টেম্বর যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভায় এই জনবিরোধী বিল পাস হয়ে যায়। আন্দোলনকে 'অশান্তিকর' দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ছড়ানো হয়েছে ভুয়ো তথ্য। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের 'আন্দোলনজীবী' আখ্যা দিয়েছে।

লকডাউনের শেষে নতুন খেলা শুরু হলো, আনলক। মানুষের মনে করোনার ভয় কমলেও, স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখা হলো। কিন্তু সিনেমা হল, শপিং মল সব কিছু খোলা রইল। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কী করোনা আসে? অনলাইনে ক্লাস হওয়াতে ৯১% ছাত্রছাত্রী, যাদের অনলাইনে পড়ার সুযোগ নাই, তারা বঞ্চিত হতে শুরু করলো। প্রত্যন্ত গ্রামে এখনো ইন্টারনেট সহযোগিতা পৌঁছায়নি। তাছাড়া, সবার আধুনিক মোবাইল কেনার মত অর্থের অবস্থাও নাই। তাহলে তাদের কী হবে? অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা এই অনলাইন পড়াশোনার চাকায় পিষে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, প্র্যাক্টিক্যাল বা হাতে কলমে

শিক্ষা। অনেক বিষয় আছে, যেগুলো নিজে হাতে না শিখলে, ব্যবহারিক জ্ঞান পাওয়া অসম্ভব। সেসব ক্ষেত্রে, যাদের অর্থ আছে, যারা বিত্তশালী, তারা বিভিন্ন অনলাইন এডুকেশনাল অ্যাপ থেকে শিখতে পারবে, বাড়িতে প্র্যাক্টিক্যালের সামগ্রী কিনে। কিন্তু যারা সেই প্রিভিলেজ পায় না, তারা কি করবে?

১২ই ফেব্রুয়ারি,২০২১ বাংলায় স্কুল খুললেও কলেজের কোনো কথাই নাই। আবার, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছে, ২০ শে এপ্রিল, ২০২১ থেকে স্কুল বন্ধ গরমের ছুটি হিসাবে। এদিকে কলেজ তো খোলেইনি। কিন্তু অফলাইনে যেমন ফিজ নিত, ঠিক তেমন হারেই ফিজ নিচ্ছে কলেজগুলো। তার মধ্যেও একটা ক্লাসও হয়তো ঠিকমতো হচ্ছে না। মানে, মোবাইলের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে, নেটের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে, আবার কলেজের অন্যায্য ফিজও আপনাকে দিতে হবে। এই আর্থিক প্রতিযোগিতায় কতজন পেরে উঠবে? এর মধ্যেই কখন নতুন শিক্ষানীতি চালু হয়ে যাবে জানতে পারবেন না। শিক্ষা বেসরকারিকরণের সমস্ত ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে।

আনলক-লকডাউন খেলার সুযোগে একের পর এক বিল এভাবেই পাস হয়েছে। বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ হয়েছে একাধিক সরকারী সংস্থা ও ব্যাংকের। রেল, বিমান বেসরকারী হয়েছে। BPCL, NEEPCO, শিপিং কর্পোরেশন, Concor ইত্যাদি সংস্থাও বেচে দেবার উদ্যোগ চলছে।

এর বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, মানুষ বুঝতে শুরু করেছে কেন্দ্র সরকারের কর্পোরেট দালালির স্বরূপ। পূর্বোক্ত আইন ও বিলগুলির বিপক্ষে প্রতিবাদ সভা হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে, NRC-CAA-NPR এর ইস্যু নিয়ে আবার সবাই কথা বলতে শুরু করেছে। আর তাই শাসক ভয় পাচ্ছে। আবারও করোনা আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে। শীঘ্রই লকডাউন করার কথা ভাবা হচ্ছে। দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের তুলিয়ে দিতে পারে কেন্দ্র কোভিডের জুজু দেখিয়ে — এমনটাই আশঙ্কা করছেন অন্নদাতারা (সূত্র — বর্তমান-২০/০৪/২০২১)। এটা বলাই যায়, তাঁদের আশঙ্কাই সত্য।

২০২০ সালের সেই ভয়াবহ দিনগুলো ফেরৎ আসতে চলেছে। দিল্লিতে লকডাউন ঘোষণা হয়েছে, অন্য জায়গায় হতে দেরি নাই। বিভিন্ন জায়গায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। তাঁরা জানেননা, কীভাবে সংসার চলবে, কী খাবেন, খেতে পাবেন কিনা, তাই অনিশ্চিত।

Email ID : swarnavabhattacharya9@gmail.com

আমি গ্রীসের কোন দার্শনিক নই, নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু আমিও নিজেকে সারা বিশ্বের বাসিন্দা হিসেবে দেখতেই পছন্দ করি, তা আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন। সারা বিশ্বের চলমান ঘটনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি আপনার কিংবা অন্য দশজনের মতো আমাকেও স্পর্শ করে। সেজন্যই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখালিখি করার ক্ষুদ্র 'অপচেষ্টা'।

-অভিজিৎ রায়

ভোট-সার্কাস--গণতান্ত্রিক উৎসব?

-অর্পণ

"ভোট"-কথাটা শুনলেই কেমন যেন অকাল উৎসব, কোথাও আসন্ন ভীতি আবার কোথাওবা টি-আর-পি বাড়ানোর খেলার অনুভূতি জাগে। পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতন্ত্র এই ভারত, আর সেই ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব এই নির্বাচন। সত্যিই কি তাই? গণতন্ত্রের প্রভাবকে অমলিন রাখতে কি সক্ষম এই ভোট? আলোচনা করা যাক...

দেশের ১০০ জনকে জিজ্ঞেস করুন গণতন্ত্র কী?খায় না মাথায় দেয়? ৯৯ জন অকপটে জানাবে "এই যে ভোট দিই আমরা"!, মানে এই ভোট দিয়েই তারা সন্তুষ্ট, ভোটের দিন ওই একদিনের রাজকীয় অনুভূতিতেই তারা খুশি, ঠিক এর বিপরীতে একটা ছবিও আছে, যেখানে ভোট আসছে শুনলে নিরীহ পাড়াটা তটস্থ হয়ে ওঠে আসন্ন খুনোখুনি, সন্ত্রাসের ভয়ে, বৃদ্ধা মাকে নিজের ছেলেকে হারানোর ভয় আঁকড়ে ধরে। এইসব নির্বাচনী হিংসার কোনটার পিছনে যে কে বা কারা থাকে তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক তরজা আর মিডিয়ার প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। মিডিয়াও নেমে পড়ে ঘটনাকে মশলা সহযোগে কে কত রোমাঞ্চকর ভাবে পরিবেশন করতে পারে তার খেলায়, যত রক্তপাত হবে, যত মায়ের কোল খালি হবে প্রাইমটাইমের টি আর পি তত বাড়বে, ফলত, তাদের কাছে এ এক দারুণ উৎসব, খেলা।

ক্রিকেট মোটামুটি আমরা সবাই দেখি, আই পি এল নামের একটা ক্রোড়পতি লিগ কারোরই অজানা নয়, আমরা কী দেখি? কিছু দলের লড়াই চলছে ট্রফির আশায়, আর যেটা দেখি না সেটা হল প্রত্যেকটা দলের পিছনে বসে আছে কিছু ইনভেস্টর, যারা টাকা ঢেলেছে এক একটা দলের পিছনে। সেই দল ট্রফি জিতলে তার শেয়ার ভ্যালু, বিজ্ঞাপন ভ্যালু এটার থেকে বিপুল লাভ আসবে ইনভেস্টরের পকেটে, তাই আই পি এল যে কোনো মূল্যে করানো চাই-ই, তা সে করোনায় দেশবাসী যতই অনাহারে মরুক লকডাউনে। খেয়াল করলে দেখবেন, ভোটও তাই, করোনার গ্রাফ দৈনিক ৩ লাখ ছাড়ালো, কিন্তু ভোট স্থগিত? নৈব নৈব চ, এখানেও কারণটা খুব সহজ, রাজনৈতিক দলগুলোর বেশিরভাগেরই শিল্পপতি ইনভেস্টর থাকে যারা বিপুল টাকা পার্টি ফান্ডে ঢালে, লক্ষ্য? ওই, ক্ষমতায় এলে তাদের সুবিধা করে দেওয়া। ভোট স্থগিত হলে, এত হাজার কোটির ইনভেস্টমেন্ট সব ভেস্তে যাবে যে!!

ভোট যখন হচ্ছেই তখন জনগণের মগজধোলাই না হলে চলবে কীভাবে? অতএব সমাবেশ, মিটিং মিছিল সব চলবে....আর সেই সার্কাস দেখতে ভিড়ও হবে... প্রধানমন্ত্রী রাতে ভাষণ দেবেন সোস্যাল ডিসট্যান্সিং মানার পরদিন সকালে সমাবেশে আসবেন হেলিকপ্টারে চড়ে, তবুও লোকজন বেশ খুশি, মুখিয়ে থাকবে শুনতে কোন নেতা কার নামে কী চটুল মন্তব্য করল...আর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ঠাঁই পায় এই কাদা ছোড়াছুড়ি গুলোই। বিক্রি বাড়াতে হবে না??

আচ্ছা, উৎসব মানে আমরা কী বুঝি? পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধা, শালীনতার সীমায় থাকা। কিন্তু হায় এই উৎসবে যদি সেটা আশা করেন আপনি তবে সোনার পাথরবাটির আশায় আছেন।জাতপাত, ধর্ম, উন্নয়ন, সব

কিছুই হয় প্রচারের হাতিয়ার। প্রত্যক্ষ গালিগালাজ থেকে শুরু করে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে লোকজনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলায় সব দলের জুড়ি মেলা ভার,শীতলকুচিতেই দেখুন, কেউ বলে বাহিনীর দোষ, কেউ বলে মমতার উস্কানিতেই ঘটেছে, কারণ যাই হোক তৃণমূল বিজেপি কোনো পক্ষই কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করতে ছাড়েনি..., একে অন্যের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে চাপা পড়ে গেছে বাবা হারা মেয়েটা, বা ছেলে হারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, হয়তো স্বামী হারা মেয়েটা টিভিতে দেখলো হেডলাইন, "শীতলকুচি নিয়ে কী বললেন বিজেপির মুখপাত্র, পাল্টা কী বললেন মমতা? জানতে হলে আজ রাত ৮ টায়"...টি আর পি কা খেল মশাই টি আর পি!!

ভোটের দিনগুলোতে নেতাদের পারলে পা ধরে জড়িয়ে পরবে এমন ভাব থাকে, ফ্ল্যাটে থাকা স্বচ্ছল প্রার্থী নেমে এসেছে পথের ধুলোয়, মাথা নীচু করে ঝুপড়ি গুলোতে
ঝুঁকে পড়ছে, চকচকে পাঞ্জাবি ছেড়ে "আমি তোমাদেরই লোক" প্রমাণে নিজেদের পাঞ্জাবিতে পথের ধুলো লাগাতে ব্যস্ত। এও এক সার্কাসের অঙ্গ।

এমনি করে ভোট আসে ভোট যায়, সার্কাস,সন্ত্রাস, উৎসব একসাথে চলে, একদল ক্ষমতায় আসে আরেকদল বিদায় নেয়, কিন্তু ক্ষমতার মুখগুলো থেকে যায় একই, ঋতুবদল, দিনবদলের মতো দলবদলও এ সার্কাসের এক্স ফ্যাক্টর,
ফলে কী হয়, সার্কাসে জোকার গুলোর বেশভূষা পাল্টায়, আজ লাল জামা, কাল সবুজ তো পরশু গেরূয়া পোশাক.. কিন্তু জোকারের মুখগুলো থেকে যায় একই....তাই এ সার্কাসেও একই খেলা চলতে থাকে দিনের পর দিন।।

মার্ক্সিজম ও গণচৈতন্য

-অমিত দাস

"সমাজে যুক্তি অযুক্তিকে রেখেছে কিনারায়।"-- ফুকো

প্রকৃত গণজাগরণ কীভাবে সম্ভব? যেকোনো মুহূর্তে ঘটনাপ্রবাহের জনআন্দোলন রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারে একথা ঠিক, কিন্তু সাময়িক চমক তো একজনকে সচেতন সমকালীন বানায় না, তাই শক্তিশালী উত্তরাধুনিক গণচেতনার উদ্দেশ্যে আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রীয় বা নানা অ-সরকারী ব্যক্তি বা সমষ্টির কর্মপ্রকৃতি ও ক্রিয়া কীরকম হওয়া উচিত ?

আচ্ছা , এই যুক্তি-অযুক্তি ,কারণ-অকারণ , একমুখীনতা বহুমুখীনতা ,এককককথন-দ্বিরালাপ সম্পর্কে যারা সচেতন তারা তো সত্যিকারেরই সমাজের কিনারায় থাকে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্তরের মানুষ এক-এক পরিসরের জামা-জুতো পরা , সেখানে দুই একজন সচেতন মানুষ দেশীয় 'বোরোলিন' মাখলেও '৪৭ফ'রা তো 'ফেয়ার এ্যান্ড লাভলি'র দলেই। আর রাজনৈতিকতন্ত্র পরিবর্তনে তাদের ভূমিকাই বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হল এবার কীভাবে ? মানুষ যে গাছের পাতা দেখে হাওয়ার অস্তিত্ব অনুভব করবে,সে ক্ষমতাও খুব কম মানুষের আছে।

'আত্মা' শব্দটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো শব্দ-- 'আত্ম' যা তা-কে নির্দেশ করে,কিন্তু এখন দূষিত, তাই ব্যবহৃত হয় 'আমি'।জ্ঞানরাজ্যে 'ধর্ম' দূষিত, তাই শিল্পের ধর্ম হয়েছে 'ময়ূরাক্ষী' ,'সুবর্ণরেখা' ইত্যাদিরা। এরা নিরাপদ, কিন্তু একটা পার্টির মাথাকে জল দিয়ে স্নান করানো এবং আদর্শবীজগত 'ধুলোমাখা ' টোটেমগুলিকে নবায়ন একদিকে যেমন প্রয়োজন অন্যদিকে বিপদ। লক্ষ করি ,এই নতুন শব্দেচেতনার আকর্ষণেই রাজনৈতিক মুখোশের পতন-অভ্যুত্থান অথবা রূপান্তর হয়েছিল-হয়, হয়ত হবেও। কারণ শব্দ জ্যান্ত,শব্দ তার বহুমুখীশক্তি অনুযায়ী মানুষকে সচেতন করে। রোঁলা বার্থ-এর 'ডেথ অফ্ দা অথর' প্রয়োগ করলে এই তত্ত্ব ---সমাজের হৃদস্পন্দন যে সমষ্টি--এবং সেই সমষ্টির হৃদস্পন্দন যে কিছু বাণী ,তা প্রমাণিত হয় ।

এবার কীভাবে ? সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু ভেঙে গেছে ঠিক এই কারণেই--এ কথা মনে রেখেই--পোস্ট-মার্ক্সসিস্টরা বলে ,শোষণপোষাক পরিবর্তিত হয়েছে, আধেয় নয় ,উপেয় নয়।ফুকোর সেই আধুনিক 'কারাগার-থিওরি'(†ছবি)-তো সেই কথাই বলে।তবে ?

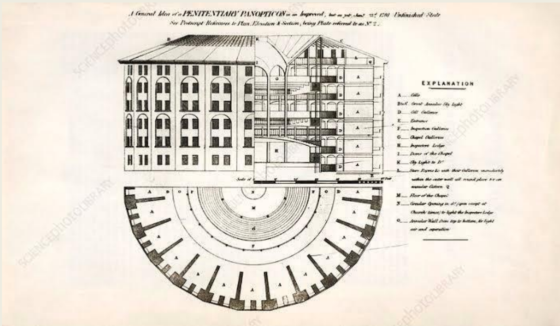
মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস ,'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে লিখেছিলেন--এক সময় নারীপুরুষ জঙ্গলে অনেকটা একই রকম কাজ করত পরবর্তী সময়ে এক ব্রাহ্ম-মুহূর্তে যখন নারী বুঝতে পারল তার পেটের এক অংশে কিছুটা ভারী হয়ে উঠছে এবং সে কোনো কাজ করতে পারছে না , তখন মন ও কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-মিথস্ক্রিয়ায় জন্ম নিল প্রথম সমাজ ব্যবস্থা। তারপর নানা তন্ত্র শেষে আজ 'এক' তন্ত্রে আমরা আছি। প্রশ্ন হল এই যে বিবর্তন ...তার উৎসেও বিমূর্ততা এসে দাঁড়াচ্ছে। যেখান থেকে অধিবিদ্যা যেখান থেকে অসংখ্য পাঠকৃতি তৈরি হচ্ছে--এদিকে সমষ্টিমানুষের জন্য প্রয়োজনের বস্তুধর্মিতা ছাড়া পথ নেই ---আবার যে উত্তরআধুনিক সমকাল তা দাবি করছে বিকেন্দ্রীভূত বহুমাত্রিকতা।

ক্ষমতার পিরামিডের সঙ্গে এই কনসাসনেস পিরামিডের উচ্চে (মানুষিক দৃষ্টিকোণে) অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ লড়ে হেরে বা জিতে যে-ভাবেই হোক সমকালীন রাজনৈতিকশক্তিকে প্রভাবিত করতে

পারেনি--ধরা যাক কোনো এক পার্টির পূর্বের বা বর্তমানের শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতই জনমুখী এবং জীবনমুখী সমাজতান্ত্রিক ছিল বা আছে-- যদি তাই হয় তাও তো 'ভালোর' ভালোকে স্বীকার করতে গিয়ে স্বহৃদয় সামাজিক মানুষটি ফেঁসে গেছে, কারণ উত্তরাধুনিকতা বলে ''হেগেলের চিন্তাও বায়াসডহীন নয়, কারণ হেগেল চিন্তা-চর্চা করার জন্য রাজনৈতিক সাহায্য পেয়েছিলেন।'' রাজনৈতিকবোধ ছাড়া কোন মানুষ আধুনিক বা উত্তরাধুনিক হতে পারে না--আবার সম্পূর্ণ রাজনৈতিকবোধে বা স্রোতের শক্তিতে প্রভাবিত হলেও সত্য অনেক দূরে চলে যাবে.? অনেকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলবে কিন্তু বহুমুখীনতা স্বীকার করলে--পরস্পর বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ড হওয়া স্বাভাবিক , এবং তা প্রয়োজনও। এবার প্রশ্ন হল জনগণ কীভাবে তা গ্রহণ করবে? আবার জনগণ সমকালীন না হলে তাও আরেক সমস্যা? শাসকদলের দাসত্ব করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না --যেমন এখন চলছে।

তাহলে এই গণমানসে প্রকৃত 'গণজাগরণ' কীভাবে সম্ভব? নাকি সেই সময়ের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আবার নতুন কোন ইজম এসে হাজির হবে?

***



†

(† ছবি--বেন্থামের panopticon বা 'কারাগার' ডায়াগ্রাম , ফুকো যাকে রূপক হিসেবে দেখেছেন।)

মতামত জানাতে পারেন-

Email- amitd4495@gmail.com

কাশ্মীরের অভিজ্ঞতা

-বিতান সানা

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তখনও সেইভাবে আসেনি। ২ মাস আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট বুক থাকায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়েই পড়লাম। গন্তব্যস্থল জম্মু। যদিও ট্যুর প্ল্যানটা ছিলো জম্মু, কাটরা হয়ে কাশ্মীর। শেষবার কাশ্মীর গেছিলাম ২০০৯ সালে। তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। স্মৃতিতে কিছু কিছু দৃশ্য বিক্ষিপ্তভাবে রয়েগেছে। যদিও কাশ্মীরে সেবার বরফ দেখার সুযোগ হয়নি। এবার তাই বরফ দেখার ইচ্ছে নিয়েই ট্রেনে চড়েছিলাম। হাওড়া থেকে হিমগিরি ছাড়ে রাত ১১.৫৫ নাগাদ। জম্মু পৌঁছয় তৃতীয়দিনে দুপুরের দিকে। দীর্ঘ একটা জার্নি। অনেকেই তাই ফ্লাইট প্রেফার করেন। তবে সেটা মধ্যবিত্ত পরিবার এফর্ট করতে পারবে না। তাই ট্রেনেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যথারীতি তৃতীয়দিনে জম্মু পৌঁছলাম। ট্রেনের দুদিনের জার্নি সম্বন্ধে বলার সেরম কিছুই নেই আসলে। জম্মু রেলস্টেশন থেকে বাইরে বেরোতে হলে সবাইকে নিয়মিতভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে করোনা টেস্ট করতেই হচ্ছে। অগত্যা স্যাম্পেল দিয়ে, ফোন নাম্বার আর ঠিকানা লিখে স্টেশনের বাইরে এলাম। আমরা ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম নামের একটি ট্যুর কোম্পানির সাথে কাশ্মীর বেড়াতে এসেছি। যিনি ট্যুরটিকে ম্যানেজ করছেন সেই ভদ্দরলোক খুব ভালো মনের মানুষ। সবার অভিযোগ শোনেন, মাথাঠান্ডা রেখে সবসময় কথা বলেন। আমি ওনাকে একদিনও মাথা গরম করতে দেখিনি। জম্মু স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটি ধাবায় লাঞ্চটা সেড়ে সবাই কাটরার উদ্দেশ্য রওনা হলাম। জম্মু থেকে কাটরার দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার মতো। কাটরা মূলত বিখ্যাত আধ্যাত্মিক স্থান হিসেবে। বৈষ্ণদেবীর মন্দিরে পায়ে হেঁটে হোক বা খচ্চরের পিঠে চড়েই হোক, যেতে হলে সবাইকে কাটরা আসতেই হবে। কেউ চাইলে ডুলি করেও বৈষ্ণদেবী যেতে পারেন। ডুলি মূলত পালকির মতো, কয়েকজন মানুষ সেটা বহন করে নিয়ে যান। যাদের আর্থিকঅবস্থা ভালো বা যারা অতটা দূরত্ব খাড়াই চড়তে পারবেন না, তাদের জন্য হেলিকপ্টরের ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিগতভাবে নাস্তিক হওয়ায় অতটা রাস্তা চড়ে মন্দির দেখার কোন ইচ্ছেই আমার ছিলোনা। বাবা মা আর আমার দিদিও অনেকাংশে আমার মতোই চিন্তাধারা রাখে, তাই ওরাও আর যেতে চাইলোনা। তবে আমাদের গ্রুপের ৩টে ফ্যামিলি রাত থাকতে থাকতেই বৈষ্ণদেবীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওরা পরেরদিন দুপুরে আবার হোটেলে ফিরে আসে। এই সময়ে আমি হোটেলের ম্যানেজারের সাথে জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি জানালেন পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে সব চুপচাপ আছে, কিন্তু, যে কোনো সময় যা কিছু ঘটে যেতে পারে। পরিস্থিতি এতটাই বাজে। ২০১৯ এর ৫ই আগস্ট দেশের কেন্দ্রীয় সরকার একপ্রকার অগণতান্ত্রিক উপায়ে জম্মু-কাশ্মীরবাসীকে জোর জবরদস্তি চুপ করিয়ে তাদেরকে রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দায় পরিণত করেছে। কাশ্মীরের বুকে সেই সময়ে নিস্তব্ধে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা, যা আমরা আজও জানতে পারিনি। তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের তৈরি করা সৈন্যের মাধ্যমে। তাদের উপর পড়েছে একের পর এক টিয়ার শেল। কতজন যে কাঁদুনে গ্যাসের শেলের আঘাতে আহত হয়েছেন, কতজনের চোখ নষ্ট হয়েছে আমরা তা কোনোদিন জানতেও পারবোনা। ম্যানেজারের মুখ থেকে এই কথাগুলোই শুনছিলাম। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হলো বাইরে সরকার আমাদের যা দেখাচ্ছে আর ভেতরের আসলে যা চিত্র, তার

মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। জার্নির শুরুতেই এরমসব তথ্য আমাকে আরও বেশি করে সতর্ক আর কৌতূহল করে তুললো। সেদিনটা বিকেলে আশপাশ ঘুরে, মার্কেট ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। পরেরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। জম্মু থেকে শ্রীনগর প্রায় ২৯০ কিমি। পৌঁছতে পৌঁছতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেল। ট্রাভেলার থেকে নেমেই রীতিমতো ঠান্ডায় কাঁপতে আরম্ভ করেছি। ফোন খুলে গুগলে অমনি তাপমাত্রাটা দেখে নিলাম। ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। খাবারের মধ্যে আমার আমিষ প্রিয়, কাটরা আধ্যাত্মিক স্থান হওয়ায় সেখানে হোটেলে আমিষ রান্না নিষিদ্ধ। শ্রীনগরে এসেই তাই রাতে কষা মুরগির মাংস রেঁধে দিলেন রণজিৎজেঠু। আমাদের সঙ্গে ঠাকুর হিসেবে গেছিলেন রণজিৎ জেঠু আর তাকে সাহায্য করতে রবিদা। দুজনের বাড়িই বসিরহাট। কাশ্মীরে ঠান্ডা পড়বেনা ভেবে দুজনের কেউই সোয়েটার বা জ্যাকেট নিয়ে যাননি। মা তাই শ্রীনগরে গিয়েই ওদের জন্য দুটো সোয়েটার কিনে দিলো। আমার কাছে একটি ইনার থাকায়, আমিও সেটা রবিদাকে দিয়ে দিলাম। কিছুটা হলেও যাতে ঠান্ডা মানিয়ে যায়। পরেরদিন সক্কাল সক্কাল ডাললেকের শিকারায় চড়ার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে ৩০০-৪০০ মিটারের দূরত্বেই ডাললেক। হোটেল থেকেই ইমতিয়াজ নামের এক ভদ্দরলোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। উনিই শিকারা ডেকে দিলেন। এসময়ের মধ্যে আমি তার কাছে শ্রীনগরের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাইলাম। ভদ্দরলোক বেশ ভালো ভালো কথা বললেন। কেন্দ্রের এই নীতির বেশ প্রশংসা করলেন। বললেন আগের চেয়ে পরিস্থিতি অনেক ভালো। অনেক শান্ত কাশ্মীর। ৩৭০ ধারা ওঠার পর অবরুদ্ধ কাশ্মীরের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিলো প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা। কী পরিস্থিতির মধ্যে ৩৭০ ধারা এবং তার পরবর্তী Covid-১৯ এর দরুণ লকডাউনের সময়টা মানুষ কাটিয়েছেন সেটাই জানতে চেয়েছিলাম। সেখানের মানুষের আর্থিক অবস্থা জানতে চাইলে বললেন কোনো সমস্যা নেই, একটু আর্থিক ক্ষতি হয়েছিলো ঠিকই তবে মানুষ আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। পরে জেনেছিলাম ইমতিয়াজ শ্রেণীগতভাবে বেশ টাকাপয়সাওয়ালা। অনেক ব্যবসা রয়েছে তার। চারচাকার একটি ভালো গাড়িও রয়েছে যার রেজিস্ট্রেশন দিল্লির। শিকারার ওই ২.৫ ঘন্টা, জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি। লেকের ধারে সারি সারি হাউসবোট দাঁড়িয়ে যেন প্রতিনিয়ত আমাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে। শিকারায় আমাদের সাথে সাথে ভেসে চলেছে একাধিক পণ্যবাহী শিকারা। কেউ জুয়েলারি বিক্রি করছে, কেউ নানান খাবার, কেউ আবার নানান পানীয়। কাশ্মীরের কাওয়া নামক একটি পানীয় বিখ্যাত। স্বাদেও দুর্দান্ত। আপনারা কাশ্মীর গেলে অবশ্যই তা ট্রাই করে দেখবেন। ডাললেক থেকে দূরের কোহ-ই-মারান ফোর্টটাও বেশ চমৎকার দেখা যায়। এই ফোর্ট দুররানি সাম্রাজ্যের সময় তৈরি। ডাললেক থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে ১২-১টা বেজেই গেল। এসেই লাঞ্চ করেই আবার রওনা। এবারের গন্তব্য মুঘল গার্ডেন, টিউলিপ গার্ডেন। টিউলিপ গার্ডেন, জায়গাটা অপূর্ব। পুরোনোদিনের হিন্দি সিনেমার অনেক গানের দৃশ্যে এই গার্ডেন দেখেছি। যদিও সবসময় এটা খোলা থাকেনা, বছরের এই মাসগুলোয় এটা খোলা থাকে। যে যাবেন, সেই মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির এই অপরূপ সৃষ্টিকে প্রাণ খুলে দেখতে চাইবেন। গার্ডেনের একদিক পাহাড়ে ঘেরা, একদিকে পাইন গাছের বন, দূরে সাদা বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতমালা। রোদ ঝলমলে পরিবেশ। এরইমধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কাশ্মীরে সূর্য অস্ত যায় সন্ধ্যে ৭টার পরে। তাই সন্ধ্যেটাও বেশ দেরি করে নামে। মোঘল গার্ডেন আর টিউলিপ গার্ডেন বাদে আরও দুটো গার্ডেন দেখেছিলাম, তবে নামটা ঠিক মনে করতে পারছিনা। দুটো গার্ডেনই অনেকটা মোঘল গার্ডেনের মতোই। সেদিন জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্নর মনোজ সিনহাও এসেছিলেন টিউলিপ গার্ডেন উদ্বোধন করতে। শেষে টিউলিপ গার্ডেন দেখে সন্ধ্যে সোয়া সাতটার দিকে সবাই আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

ট্যুরের ৭ম দিনের গন্তব্য ছিলো সোনমার্গ। জম্মু থেকে ৯০ কিলোমিটারের পথ। সোনমার্গ পৌঁছে দেখি চারিদিক বরফে ঢাকা। বরফের মধ্যে আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের জন্য রয়েছে স্কেটিং, স্নো বাইক রাইডিং। স্লেজগাড়িতেও কেউ কেউ চড়তে পারেন। এর আগে কোনদিন স্বচক্ষে বরফ দেখিনি, তাই কোনরকম স্লেজগাড়ি বা স্নো বাইকের অভিজ্ঞতাও নেই। শেষে স্নো বাইকটাই বেছে নিলাম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা, পেছনে বসে কেউ কেউ ভয়ও পেতে পারেন। সমতলে এসে নিজেও স্নো বাইকিং করলাম। আমার মোবাইল ক্যামেরায় স্নো বাইকের ড্রাইভারকাকু আমার সেই স্নো বাইক চালানোর দৃশ্য বন্দি করে দিলেন। সোনমার্গের মিষ্টি আর বরফময় অভিজ্ঞতা নিয়েই হোটেলে ফিরলাম বিকেলের দিকে। পরেরদিন আমাদের গুলমার্গ যাওয়ার পালা। যথারীতি ১০-১১টার দিকে পৌঁছে গেলাম গুলমার্গ। ২০০৯ এ যখন প্রথম গুলমার্গ এসেছিলাম, সেবার গুলমার্গ ছিলো সবুজ। সাধারণত ভ্যালি যেরম হয়। এবার গুলমার্গকে দেখলাম পুরোটাই সাদা চাদরে মোড়া।

স্লেজ গাড়ি টেনেই সংসার চলে গুলমার্গের গুলজার আহমেদের। পরিবারে মোট ১০ জন। বাবা, মা, এক বোন, স্ত্রী আর পাঁচ ছেলেমেয়ে। পরিবারের মধ্যে একমাত্র আয় করেন তিনি। গুলমার্গ ভ্যালিতে আয়ের অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় ভ্যালিতে কর্মরত পঁচিশ হাজার গুলজারদের ইনকামের একমাত্র পথ এই ট্যুরিজম অর্থাৎ স্লেজগাড়ি, গাইড ইত্যাদি। স্লেজগাড়ি একটি কাঠের পাটাতন। ট্যুরিস্ট স্লেজের ওপর বসলে গোটা ভ্যালিতে সেটাকে শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে স্লেজের চালক দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যান। স্লেজ গাড়ির সময় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। বরফ গলে গেলে, ইউনিয়নের দেওয়া ঘোড়ার মাধ্যমে তাদের সংসার চলে। এখানের ইউনিয়নে কেবল ইউনিয়নের নেতাদের একচেটিয়া আধিপত্য। বরফের মরশুমে ইউনিয়ন গুলজারদের বেতন হিসেবে মাসে ৬০০০-৭০০০ টাকা দিলেও, বরফ গলে গেলে তাদের বেতন কমে দাঁড়ায় ৩০০০ টাকা। কারণ স্লেজ রফিকদের নিজেদের হলেও, ঘোড়া ইউনিয়নের। এই মরশুমেও ইউনিয়নের নেতারা ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা বেতন নিয়ে থাকেন। তাদের কাজ ট্যুরিস্ট দলের সাথে যোগাযোগ করে দরদাম করা। যারা স্লেজ টানেন বা গাইডের কাজ করেন ট্যুরিস্ট মারফৎ পাওয়া টিপ্সই তাদের এক্সট্রা ইনকাম যা ইউনিয়নকে দিতে হয়না। তবে সেই টিপসের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। কেউ ১০, কেউ ২০। কেউ খুশি হয়ে ১০০,৫০০ ও দিয়ে থাকেন। এইটুকু বেতনে কিভাবে তাদের সংসার চলে বা তাদের দারিদ্র্য কতটা সেটা আপনি আশা করি আন্দাজ করেই ফেলেছেন। স্লেজগাড়িতে একজন বসে থাকবে, আরেকজন তাকে টেনে নিয়ে যাবে এটা আসলে কতটা পরিশ্রমের কাজ সেটা যে টানছে কেবল সেই জানে। আমরা কেবল মনে মনেই সেটা অনুভব করতে পারি। প্রথমে যেতে না চাইলেও একপ্রকার জোর করেই উঠে পড়ি কারণ আমরা না উঠলে ওদের সংসার চলবে না। যদিও কিছুটা গিয়ে নেমে হাঁটতে থাকি আর এইখানের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তার কাছে জানতে চাই। গোটা ভ্যালিতেই বুট পরে হাঁটতে চেয়েছিলাম কিন্তু, তিনি একপ্রকার জোর করেই আমাকে স্লেজে বসালেন। তাই খারাপ লাগলেও অগত্যা মেনে নিতেই হলো। প্রশ্নের আকারে গুলজার আহমেদের সাথে কথোপকথন:

প্র: ৩৭০ ধারা তোলার পর পরিস্থিতি কেরম?

উ: একটা সরকার আমাদের না জানিয়ে, আমাদের মুখ বন্ধ করে কিভাবে এরম একটা ধারা বাতিল করতে পারে?

প্র: কেরম ক্ষতি হয়েছিল?

উ: দুবছরে আমরা একপ্রকার শেষ হয়ে গেছি। সরকার এই সময়ে কিচ্ছু দেয়নি আমাদের। চুপ করিয়ে, ঘরে আটকে রেখে আমাদের সম্মান কেড়ে নিলো।

প্র: ১৯৯০ এর ঘটনাটা আসলে কী?

উ: তৎকালীন গভর্নর জগমোহন মালহোত্রা যিনি বর্তমানে বিজেপির সদস্য, তার জন্যই ভ্যালিতে এসব হয়েছে। ও এসে আমাদের মুসলিম ভাইদের ওপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করলো। ও চাইছিলো এইখানে হিন্দুদের একনায়কতন্ত্র হোক। মুসলিম ভাইদের অবহেলা করা শুরু হয়। সেই পরিস্থিতি থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাড়বাড়ন্ত। কাশ্মীরি পন্ডিতদের আমরা মন থেকে ভালোবাসি। ওরা সেদিন ভয় পেয়েই চলে গেল। কেউ ওদের তাড়ায়নি। তখন যে কজন কাশ্মীরি পন্ডিত মারা গেলেন, তাদের মৃত্যুর পর সমস্ত কাজকর্ম আমরাই করেছি। আজও যদি তারা আসে, তবে আমরা মন থেকেই অনেক খুশি হবো।

প্র: যারা বন্দুক বোমা নিয়ে আর্মিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের সমর্থন করেন?

উ: একদম না। আমি আর্মিদের সমর্থন করি। ওরা আমাদের রক্ষাকারী। যারা বন্দুক, বোমা ব্যবহার করছে তারা আমাদের ক্ষতি করছে।

প্র: যারা এসব করছে তাদের পাকিস্তান টাকা দেয়?

উ: তারা তো বিনামূল্যে এসব করে না। নিশ্চয়ই তারা টাকা পায়।

প্র: এখানের মানুষ ইন্ডিয়া না পাকিস্তান কার সমর্থক?

উ: কারও সাপোর্টার না। আমরা কাশ্মীরের সমর্থক। আমরা চাই স্বাধীন কাশ্মীর। আমরা এতদিন অনেক অবহেলিত হয়েছি, অনেক কিছু দেখেছি। আমরা এসব আর দেখতে চাইনা। Kashmir Mange Azadi।

কথোপকথন এইটুকুই। মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরছিলো তখন। তারপর তাকে কিছু টিপস দিয়ে হোটেলের পথে রওনা দিলাম। মাথায় এটাই ঘুরছিলো যে ২০১৯, ২০২০ তে কাশ্মীর যখন অবরুদ্ধ বা কাশ্মীরের বুকে যখন লকডাউন লেগেছে, তখন তাদের দিনগুলো ঠিক কিভাবে কেটেছে? এসব ভাবতেই ভাবতেই মাথাটা ভার করে আসছিলো। গাড়ির মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। জার্নির ৯ম দিনে পহেলগাঁও এর পথে যাত্রা শুরু করলাম। এই ৯দিনে শ্রীনগরে হোক বা সোনমার্গ বা গুলমার্গ, এত ঠান্ডা লাগেনি যতটা পহেলগাঁওতে এসে টের পেলাম। দুপুর ১টার দিকে এসে পৌঁছলাম পহেলগাঁও। সেখানে এমনই ঠান্ডা যে লেপের মধ্যে হিটার লাগিয়ে লেপ গরম করতে হচ্ছে। বাথরুমে খালি পায়ে হাঁটলে মনে হচ্ছে পা যেন পুড়ে যাচ্ছে। পরে বুঝলাম তাপমাত্রা মাইনাসে যাওয়ার কারণে এমনটা হচ্ছে। দুপুরে পহেলগাঁও এসে হোটেলের রুমে ব্যাগপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়লাম চন্দনওয়াররির উদ্দেশ্যে। চন্দনওয়ারি পহেলগাঁও থেকে দেড় ঘন্টার রাস্তা। সেখানেও রীতিমতো বরফের ছড়াছড়ি। আমাকে ক্যামেরায় ছবি তুলতে দেখে অনেকেই আবার এগিয়ে এসে তাদের মোবাইলে তাদের ছবি তুলে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। এরম অবস্থায় নিজেকে বেশ ক্যামেরাম্যান টাইপ ফিল হয়। চন্দনওয়ারি ঘুরে ফেরার সময় গাড়ির কাছেই একজনের সাথে পরিচয় হলো। ফারুক জানালো লকডাউনের সময় দিনে একটা করে রুটি খেয়ে থেকেছে ওর পরিবারের সবাই। ট্যুরিজম ছাড়া আর কোনো আয়ের রাস্তা না থাকায় এইভাবেই সংসার চালিয়েছে সে। সরকার থেকে তাদের এই সময়ে কিছুই দেওয়া হয়নি। এমনকি সরকারের থেকে ট্যুরিজম সেক্টর বুস্ট করার জন্যও একটা টাকা দেওয়া হয়নি। এই সময়েই তাদের আয়ের প্রধান সময়। বাকি সময় বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে গেলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এসব বলতে বলতেই সে আমার কাছে কিছু টাকা চেয়ে বসলো। পকেটে ৫০ টাকার একটা নোট ছিলো, ওটাই তাকে দিলাম। গাড়িতে উঠে দ্বিতীয় স্পট বেতাব ভ্যালি যেতে যেতে এসব নিয়েই ভাবছিলাম। শেষ স্পট আরু ভ্যালি দেখে হোটেল যখন ফিরলাম, তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে। হোটেলের একজন স্টাফের সাথে ভাব হলো। রফিক বললে আমাদের মতো ট্যুরিস্টরা হোটেলে

আসে বলেই তাদের পেট চলে। এছাড়া আয়ের আর কোনো উপায় নেই। পাহাড়ি জমিতে চাষবাসও করা হয়না। কাশ্মীরে আপেল, আখরোট, জাফরান এসবের চাষ যারা করে তারা অনেক ধনী। তাদের সাথে হোটেলের স্টাফদের তুলনা চলেনা। তার সামনে ৩৭০ ধারার কথা তুলতেই সে একপ্রকার কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলধনা করে বসলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর তার সরকারের সমালোচনা করলো। না এই ২ বছরের crisis এ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এক টাকাও তাদের দেয়নি। তাদের বেঁচে থাকার জন্য কোনো রসদ জোগাড় করতেও সাহায্য করেনি সরকার। এসবই রফিক বলছিলো রুমের হিটাররের তারটা ঠিক করার সময়। যাওয়ার সময় একগাল হেসে বললে আসি, প্রবলেম হলে আবার ডাকবেন।

পরেরদিন জম্মু ফেরার পালা। রফিককে বিদায় জানালাম কিছু টাকা টিপস দিয়ে। ছেলেটি বড্ড ভালো। মিশুকে। ব্যবহারও খুব ভালো। গাড়িতে ওঠার আগে আবার আসবেন বলে পুনরায় আমায় একগাল হাসি দিয়ে হ্যান্ডসেক করলো সে। ফিরে চললাম জম্মুর পথে। একদিকে যেরম ভূস্বর্গের মন ভালো করা অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরছি, তার সাথে রয়েছে সেই মানুষগুলোর জীবনজীবিকার অভিজ্ঞতার গল্প। আবারও করোনা বাড়ছে ভূস্বর্গে। জানিনা লকডাউন হলে ওদের কীভাবে সংসার চলবে। উগ্রপন্থীদের সাথে সেনার লড়াইয়ের খবর এখনও মাঝেমধ্যে কাগজের হেডলাইন হয়। ৩৭০ ধারা উঠেছে ২ বছর হতো চললো, জানিনা কাশ্মীরের মানুষ আজাদ কাশ্মীর পাবেন কিনা। জানিনা তারা নিজের অধিকার ফিরে পাবেন কিনা। জানিনা সেখানের বাচ্চাদের গুলির পরিবর্তে সকালের আজান শুনে ঘুম ভাঙবে কিনা। জানিনা কাশ্মীরের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিরাট একটা অংশের মানুষ এই জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে পারবেন কিনা। সত্যিই আমি জানিনা।

যুক্তিবাদ ও মানুষের মুক্তি

-মহম্মদ মহসীন

মানুষের উত্তরণের সুচক হলো, পৃথিবীর দরিদ্রতম থেকে দরিদ্রতর দেশে বসবাসকারী সাধারণ থেকেও অতি সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সর্বাধিক সুবিধা লাভের সুযোগের ব্যবস্থা করা গেছে কি না, কতটা করা গেছে।

কিভাবে এই ব্যবস্থা উপলব্ধ করা যেতে পারে বলে মনে হয়? সকলেই বলবেন প্রকৃতির রিসোর্সের উন্নততর বণ্টন ব্যবস্থা রূপায়নের জন্য পুঁজিবাদের খলনলচে পাল্টিয়ে দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। উত্তরটিকে অনেকেই বস্তাপচা বলে অভিহিত করেন। আমরা মনে করি,

এটা তো হল বিপ্লব। বহু বছর কেটে গেছে, বহু বিপ্লব ঘটেছে, কিন্তু স্বপ্নের সেই ব্যবস্থা আজও প্রণীত হয় নি। যতদিন সেই সাম্য প্রতীষ্ঠা না হচ্ছে, ততদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাঝেই তাই আমাদের পথ খুঁজতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সেই পথ হলো সংগ্রামের পথ। আন্দোলনের পথ। রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টির এটাই পথ।

পুঁজিবাদী কাঠামোয় রাষ্ট্র পুঁজিপতিদেরই স্বার্থে সব কিছু করবে। মেহনতি মানুষ সেখানে শ্রমের যোগানদার বই ভিন্ন কিছু নয়।

কিন্তু মেহনতি মানুষ তাদের শ্রম কেন পুঁজিবাদীর স্বার্থে যুগিয়েই যাবে যুগিয়েই যাবে অবিরাম?

কারণ তাদের ব্রেন এভাবেই প্রক্ষালিত।

যুক্তিবাদের প্রসারে এই মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধিতা দূরীভুত হতে পারে, তারা রাষ্ট্রের এই পুঁজিবাদ সেবার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারে। আন্দোলন জারি রাখতে পারে সার্বিক ক্ষেত্রে।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকে মুক্তচিন্তায় আগ্রহী নয়।

পুঁজিবাদ ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্র কাঠামো গড়া যেতে পারে, অন্তত পুঁজিবাদের লাভ দু আনা লোক না পেয়ে বারো আনা পরিমাণ লোকের স্বার্থে আসবে, এমন ব্যবস্থাও যে গড়া সম্ভব, তা তারা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শনের ফোকাসে থাকে এক বদ্ধমনা চেতনাঃ পুঁজিবাদের বিকল্প কাঠামো রাষ্ট্র কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারবে না। তাই বিপ্লব তো দূরের কথা সংগ্রাম আন্দোলনেই 'শিক্ষিতজন' এর সমর্থন পাওয়া দুরূহ। তারা বরং তাতে বাধা দেয়। এমনকি তাদের ব্রেন এমনভাবে প্রক্ষালিত যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীকরণ অপেক্ষা বেসরকারীকরণেই তাদের উদ্দীপনা বেশি লক্ষিত হয়।

মানুষ ভিত্তিগতভাবে পশু। অনেক পশুর ন্যায় নিজ স্বার্থসিদ্ধিতেই বেশি আগ্রহী। আবার মানুষ শুধুই পশু নয়, র‍্যাশন্যাল পশু। তার মাঝে পশুত্ব যেমন থাকে, তার মাঝে র‍্যাশনালিটিও থাকে। কথা হচ্ছে কোন গুণটি কোন গুণটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মাঝে যখন র‍্যাশনাল ভাব বেশি থাকে তাহলে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, অন্ধ অনুসরণেচ্ছা, সামগ্রিক মানবসমাজে থেকেও শুধুমাত্র সম্প্রদায়গত ঋণাত্মক চিন্তা ভাবনাগুলিও সমহারে কমতে থাকে। এটিই প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্দ্ধে ওঠা যায়, সামুদায়িক স্বার্থের জন্য কাজ করাকেই প্রকৃত কাজ ভাবা যায়, তার মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ ঘটানো যায়, সেটিই প্রকৃত শিক্ষা।

যে যত ডিগ্রীর অধিকারী হোন না কেন, তিনি যদি বাস্তব থেকে অলৌকিকে বিচরণ করেন, তাঁকে শিক্ষিত বলা যায় না। বিকশিত মনুষ্যত্ব আধিদৈবিকতা, আধিভৌতিকতার পথ থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির ত্বরণ জারি রাখে। মানুষকে বাস্তবিক মাটিতে বিচরণ করতে উদবুদ্ধ করে।

যারা বাস্তব বোধের অধিকারী তারাই মানবমুক্তির পথনির্দেশ করতে পারেন। তার স্পষ্ট অর্থ হলো, ধর্মীয় দর্শণ কখনই মানুষের মুক্তির কথা বলতে পারে না। তারা প্রথমেই মানবমুক্তির ডেফিনিশন পাল্টে দেয়। তাদের মানব মুক্তির লক্ষ্যে থাকে বার বার জন্মগ্রহণ বা পাপ পূণ্য-জনিত উদ্ভট সমস্যার উদ্ভব করে তার মনগড়া সমাধান। মানবমুক্তির মূল অর্থ সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক সুযোগ লাভের আনুপাতিক বিকাশ।

র‍্যাশান্যাল মানুষ প্রতিনিয়ত মানবমুক্তির মাইক্রো আন্দোলনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেকে সাধ্যানুযায়ী নিয়োজিত রাখেন। মানুষের মুক্তির পথ সুগম করতে যুক্তিবাদের প্রসার তাই অত্যন্ত জরুরী।

উত্তরণের পথে ধর্ম সদা সর্বদা প্রতিবন্ধক।

এই প্রতিবন্ধকতাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারে কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। ধর্মান্ধের দ্বারা তা আদৌ সম্ভব নয়। যুক্তিবাদের সিঁড়ি বেয়েই মানব সমাজের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব।

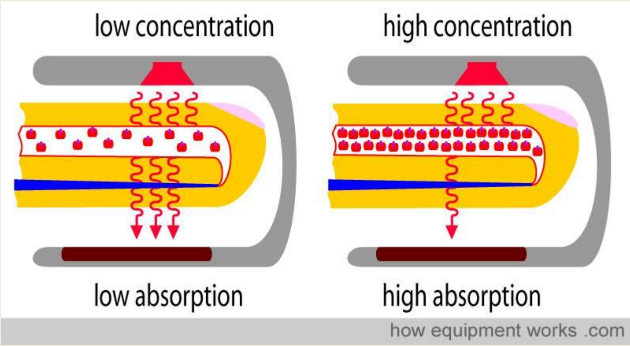
অক্সিমিটারের সাতসতেরো

-সুকৃতি দাস

বর্তমানে আমাদের জীবনের এক নতুন সদস্য হল অক্সিমিটার । হাতের আঙ্গুল দেওয়ার সাথে সাথেই জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা। কোন রক্তপাত নেই , কোন ব্যাথাও নেই । চুপচাপ লাল আলো জ্বালিয়ে জানান দিচ্ছে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন লেবেল।

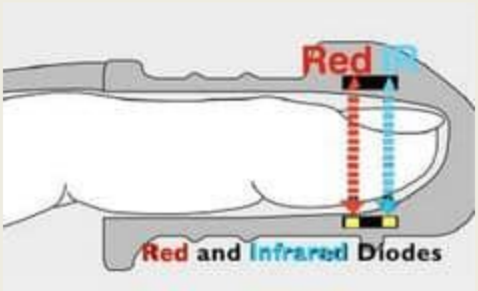
কিন্তু কীভাবে ?

আমাদের দেহে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন সঞ্চালিত হয় । কিন্তু এর মূল বাহক হল হিমোগ্লোবিন। আবার অক্সিজেনযুক্ত হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেন বিহীন হিমোগ্লোবিন দুটোর গঠন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এরা ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যর আলো শোষণ করে ও নিঃসরণ করে।

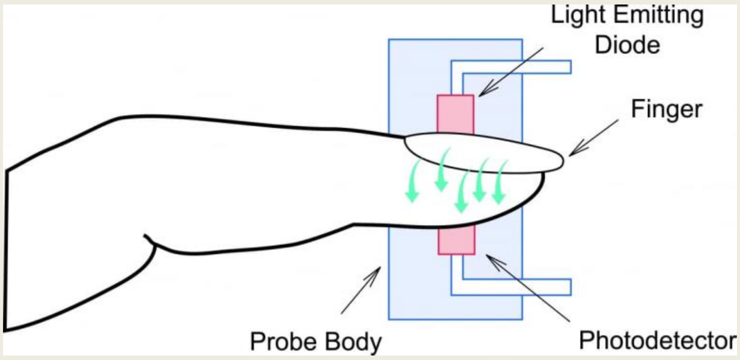


এই ধর্মকে কাজে লাগিয়েই অক্সিমিটারের কাজ শুরু হয় -

- অক্সিমিটারে থাকে ইলেকট্রনিক প্রসেসর , এক জোড়া এলইডি লাইট আর থাকে ফোটোডায়ড।
- একটা এলইডি লাইট নিঃসরণ করে লাল ৬৬০ ন্যানোমিটারের তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলো আর আরেকটি এলইডি লাইট নিঃসরণ করে ইনফ্রারেড ৯৪০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলো।



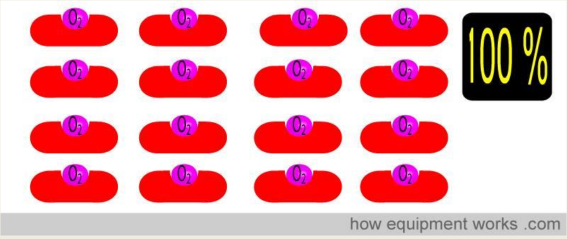
- প্রথমে দুটো এলইডির মধ্যে একটা এলইডি জ্বলে ওঠে, তারপর অন্য এলইডি জ্বলে ওঠে , সর্বশেষে দুটোই নিভে যায় । এভাবে পর্যায়ক্রমে এই চক্রটি চলতে থাকে। এক সেকেন্ডে তিরিশবার এটি হয়। আমাদের ঘরে উপস্থিত বিভিন্ন আলোর উৎস থেকে নিঃসৃত আলোর প্রভাবে এই পরিমাপে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এটি দূর করার জন্য এই চক্রটি জরুরি।



- অক্সিজেযুক্ত হিমোগ্লোবিন ইনফ্রারেড আলোকে বেশি শোষণ করে আর লাল আলোকে কম শোষণ করায় এটি এরমধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলে যায়।
- অন্যদিকে অক্সিজেনবিহীন হিমোগ্লোবিন লাল আলোকে বেশি শোষণ করে এবং ইনফ্রারেড আলো এর মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলে যায়।
- প্রতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যতটা আলো সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ শোষিত হয় না সেটা পরিমাপ করা হয় ফোটোডায়োডের মাধ্যমে। এরপর সঞ্চারিত লাল আলো বনাম ইনফ্রারেড আলোর অনুপাত পরিমাপ করা হয় ।

(যেহেতু এটি আলোর শোষণ ও সঞ্চারের ভিত্তিতে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করে । তাই হাতে নেইলপলিশ পরা থাকলে , নেইলপলিশের মিথিলিন ব্লু এই কাজকে ব্যহত করতে পারে। ফলে পরিমাপের সময় ত্রুটি হতে পারে। তাই নেইলপলিশের ব্যবহার না করাই শ্রেয়।)

- তারপর ইলেকট্রনিক প্রসেসর এই অনুপাতকে SpO2 (অক্সিজেনের স্যাচুরেশন লেবেল অর্থাৎ সম্পৃক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ) -তে পরিবর্তন করে দেয় বিয়ার — ল্যামবার্টের সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত তালিকা পর্যালোচনা করে।
- এবার অক্সিমিটারের লেবেল দেখে কীভাবে বুঝব অক্সিজেনের মাত্রা ?



যদি এর লেবেল দেখায় ১০০ । তার মানে বুঝতে হবে এর ১০০ টা হিমোগ্লোবিনের মধ্যে ১০০ টাই অক্সিজেনযুক্ত ।
তবে সাধারণত এই মান ৯৮-৯৯ -এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ৯২- এর নীচে যদি এর মান নেমে যায় তবে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

ধন্যবাদ

চিত্র সংগৃহীত — গুগল

তথ্য সংগৃহীত - https://medicine.uiowa.edu/.../pulse-oximetry-basic...
https://www.howequipmentworks.com/pulse_oximeter/

কবিতা:

ভোটের গ্রাসে

-দেশব্রত বিশ্বাস

ভোট আসে, ভোট যায়, গনতন্ত্রের পরবে
গনতান্ত্রিক গালিচা সাজে আমজনতার শবে।
লাল নেতা, সবুজ নেতা,গেরুয়া কিম্বা নীল
নেতাদের আয় বাড়তে থাকে, বন্ধ হয় মিল।
তোমার নেতা, আমার নেতা উৎসবে বাজে শ্লোগান,
ভোটপর্ব মিটে গেলেই নেতারা দেন পিঠটান।
কেউ বা জেতে, কেউ বা হারে, কেউ বা করে আপস
হেরো নেতার কিস্যু হয় না, সমর্থক পোহায় রোষ।
যেই মা আজ হারালো সন্তান, তার দুঃখ বুঝবে কে?
সব নেতারাই ঘুরে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
চারদিক জুড়ে মুষ্ঠিমেয়কে ক্ষমতায় আনার দায়ে
গনতন্ত্রের অজুহাতে কেন সাধারণ প্রান হারায়?
জনগনের সেবায় নাকি আকূল যাদের 'দিল'
কিস্যু কাজ না করেও তাদের বাড়ছে তহবিল।
গনতন্ত্র আসলে স্বৈরতন্ত্রই, মুখোসটাই কেবল ভিন্ন
নির্বাচন নামের নাটকের আড়ালে আমরা জরাজীর্ণ।
আর কত মা সন্তানহারা হলে ভোটদেব হবে তুমি শান্ত?
অনেক হয়েছে, আর না থামুক ভোটের বাঈজী নেত্য।

গণতন্ত্রের চাবিকাঠি

-জামাল আনসারী

রাস্তা কেটে ,পেরেক পুঁতে, ভাবছো তুমি কি?
ধমকে, চমকে, চোখ রাঙিয়ে, হবে না কিছু।
দেশ সবার। নয়, তোমাদের বাপের সম্পত্তি।
কৃষকের দাবি না মানলে হটছে না দেশ পিছু।
অন্নদাতার বুকফাটা কান্না, হবে নাকো ব্যর্থ
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীরা,উত্তাল প্লাবন
বলছে সবাই, ফ্যাসিবাদী সরকার অপদার্থ।
কার সাথে যুদ্ধ?কৃষকরাই দেশের জনগন।
কৃষক আন্দোলনের পাশে ফেসবুক, টুইটার
কৃষকের সমর্থনে হাত তুলেছে গোটা দেশ ।
কান পেতে শুনে রাখো ফ্যাসিবাদী হিটলার,
বেশি দিন নেই তোমার জামানা হবেই শেষ।
কৃষক আন্দোলন লিখছে এক নতুন ইতিহাস
তুমি যদি কেড়ে নাও অন্ন দাতার ভাতের বাটি।
জেনে রেখো, অহঙ্কারই পতন। হবেই সর্বনাশ।
অন্নদাতার হাতেই আছে গণতন্ত্রের চাবিকাঠি।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

-জামাল আনসারী

এক সময় যারা চোর ছিল, এখন তারা সাধু
সুযোগে কাক কোকিল হয়,যদি থাকে জাদু।

উভচরের স্বভাব যেমন জলে- স্থলে বসবাস।
বর্ণচোরা আমগুলি যেন সোনার রাজহাঁস—

মরসুমী বিহঙ্গম যত প্রতি শীত কালে আসে
এই সময়েই ভোটের গন্ধ গ্রাম গঞ্জে ভাসে।

কালো টাকা, সাদা টাকা — টাকার ছড়াছড়ি,
ভোট ভিখারি বাবুরা সব করে দৌড়াদৌড়ি।

গণতন্ত্র আর ধনতন্ত্রে নেইকো বিশেষ ব্যবধান
মুখে গণতন্ত্র আর কাজে ধনতন্ত্রের জয়গান।

নীতি,আদর্শ, বলে রাজনীতিতে কিছুই নাই ঠাঁই
সবার উপরে ভোট সত্য, ভোট বড়োই বালাই —

মারপিট, গোলাগুলি,দাঙ্গা,গণহত্যা— কিছুই নয়,
গণতন্ত্রের মহান উৎসব। তাই একটু আধটু হয় !

রাম,শ্যাম যদু মধু, রাজনীতিতে পার্থক্য নাই—
অদ্ভুত মিল। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" ভাই।

শ্রাদ্ধে চুল ফেলা!

- রাজা দেবরায়

শ্রাদ্ধে ফেলতে হবে,
মাথার সব চুল!
চুল না ফেললে তবে,
সব শিক্ষা ভুল?
চুল ফেলে বোঝাতে হবে,
মনের অবস্থা!
না ফেললে সমাজ নেবে,
তোমার ব্যবস্থা!?

"ধর্মের বিকারেই গ্রিস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম লুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেউ খোঁজ রাখেনি

-শুভায়ু রুডান

এই পাড়ায় যখন মহাসমারোহে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হরিনাম সংকীর্তন চলছে
ঠিক সেই সময়ে ও পাড়ার রহমত বই খাতাকে বিদায় জানিয়ে কাজ নিয়েছে সবজির আড়তে
মাধ্যমিকে অঙ্কে একশোতে একশো পেয়েছিল ছেলেটা।
প্রথম প্রথম অনেক সংবর্ধনা পেয়েছিল
তারপর কালের নিয়মে ভুলেছে সবাই
কেউ খোঁজ রাখেনি।

ও পাড়ায় যখন বিরাট আয়োজনে
চলছে বিশাল ঐতিহাসিক ইসলামীক জলসা
বিখ্যাত বক্তাদের বক্তব্যে ওয়াজ জমে উঠেছে।
ঠিক তখন এ পাড়ার অসীম হাতে তুলে নিয়েছে বেলচা,
একসময় হাতে থাকতো রংতুলি
এই এলাকার সেরা আঁকিয়ে,
নিজের দক্ষতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগও পেয়েছিল ছেলেটা।
তারপর যা হয়,পেটের টান তুলির টানকে হার মানাল,
কেউ খবর রাখেনি।
আগামী বছর ওরাও হয়তো বিশ পঞ্চাশ, যা পারবে চাঁদা দেবে,
কীর্তন হবে আরও জাঁকজমকপূর্ণ, জলসা হবে আরও বিশাল, ওয়াজ করতে আসবেন সেরা বক্তা।
এভাবেই চলবে,
যাদের অঙ্কের গবেষক হবার কথা ছিল, কথা ছিল যারা আর্টিস্ট হবে!
তারা সবাই অর্থের অভাবে আড়ালে রবে।

কেউ খোঁজ রাখেনি, কেউ খবর দেয়নি
কেউ খোঁজ নেবেনা, কেউ খবর দেবেনা।।

বিজ্ঞানের দিনরাত্রি

-প্রদীপ চক্রবর্তী।

বিজ্ঞানীসম্মত হলেও 'ধর্ম '
বিজ্ঞানসম্মত নয়,
ঈশ্বর বিশ্বাস এর মূলে আছে
অজ্ঞতা;লোভ;ভয়।

মঙ্গলেতে যান নেমেছে
তবু মুখ ভার,
দুর্দশার মূলে আছে
অন্ধ কুসংস্কার।

আঙুলেতে পলা-নীলা
মুখেতে ভাষণ,
সেই দেশে হবে নাকি
'আদিত্য মিশন' !

মানুষের জাত নাই
সবাই সমান,
মানুষই বানাতে পারে
দেশকে মহান।

বিজ্ঞানের দরবারে লহ তাই শরণ,
সব ফলের পিছনেতে বৈজ্ঞানিক কারণ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

-রীতা বসু

হে জালিয়ানওয়ালাবাগ!
এখনো তোমার দেহে তো দেখি কালো রক্ত ও বুলেটেরদাগ!
১০৮ বছর আগে, এই দিনে ই এক শান্তি পূর্ণ সমাবেশে,
যোগ দান করে ছিলে ওই মাঠে,
একটা ই ছিল প্রবেশের দ্বার,
কেউ কোথাও নেই আর,
হঠাৎ উপস্থিত হল দস্যু আয়ার,
ঢুকে ই সে আদেশ করল, "ফায়ার "!
বাস্।১৬০০ রাউন্ড গুলি চললো, শিশু থেকে নারী সবাই কে ওরা হত্যা করলো,
শতশত লোক কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।
পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যা ঘটে গেল!
সারা বিশ্ব হল স্তম্ভিত,
এত ভয়াবহ, এত উন্মত্ত,
রবিঠাকুর ত্যাগ করলেন " নাইট উপাধি,
এন্ডরূজ বললেন, "a massacre, a butchery "......
এত পাশবিক, এত মর্মান্তিক,
বুক জ্বলে যায়, বৃটিশ কে ধিক্।অফিসার ডায়ার!আদেশ দিয়ে ছি লে যে ডায়ার,
কি শাস্তি তুমি পেলে,
এক পাঞ্জাবী বিদ্রোহী র এক গুলিতেই তো মাটিতে লুটিয়ে পড়লে!
এভাবে কি অন্যের দেশ দখল করে থাকা যায়?
তাই তো বাধ্য হলে এদেশের পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে,
মরি হায় হায়!!!

মা , তোমার জন্য

- মৌমিতা দে

মা মানে পরম আদরের
অন্তহীন স্নেহ ,
সুখ দুঃখের সঙ্গী সাথী
ভালোবাসার মোহ।

মা মানে ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে
দেখায় পথের দিশা,
সারাজীবন সকলকে
আগলে রাখার আশা।

মা মানে সব দুঃখ বুকে চেপে
সদাই হাসিমুখ,
সব কষ্ট মুছে দিয়ে
ভরিয়ে দেওয়া সুখ।

মা মানে সকল অন্যায় মেনে নিয়ে
বুকে দেয় স্থান
যার কোলেতে মাথা রেখে
স্বস্তি পাই প্রাণ।

অনাধুনিক

- উদয় নন্দী

সন্তানহারা অশ্রু শ্রাবণে ,
প্রস্তরীভূত মা।
অধরা, অন্ধ প্রেমে,
পাথুরে প্রতিধ্বনি ধনী ।
পৌরাণিক হলেও তবে
অনভিপ্রেত নয় ।
ফুল জমে জমে পাথর হওয়ার সুভাষিত ।
তেমনি সুন্দর-সত্য বুঝি , পাথরে যখন ফুল ফোটে ।
পাথরের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে জীবনানন্দ জল।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় ,
অজন্তা ইলোরায় কি মেলে
রক্তমাংসের উম ?
জুড়ায় বোশেক জ্বালা ?
যদি তাই হয় ,
তবে কেন বোবা হয়ে যায়
"অগ্নিবীণার"-এর কবি ?
কেন স্ফটিকজল ডাকতে ডাকতে
রাজকুমারের সামনে লুটিয়ে পরে স্কাইলার্কের মত ---
স্ব-সৃজন মাধুরীমূর্তির সামনে নিথর নিথর হয়তো কোনো রামকিঙ্কর ।

মার্চ সংখ্যার রিভিউ- লিখেছেন মহম্মদ মহসীন

আর যাই হোক এবারের চেতনা কিন্তু চাবুক।

ইন্দ্রানুজ যুক্তিবাদী আন্দোলন ও জ্যোতিষের তুলনা করে আন্দোলনের এক নতুন পথ দেখিয়েছেন। তার কাটা ছেঁড়া করে গ্রহণ বর্জন করা যেতেই পারে।

অমিত দাসের লেখাটি আমার কাছে অনেক স্থলেই সাংঘর্ষিক মনে হয়েছে।

তবে **অমিত** যেমন ভেলার খোঁজে ১ বলে দাগিয়েছেন, তাতে তার এ বিষয়ে আরো লেখা পাবো বলেই আশা করি। আশা করি অনেক অস্পষ্টতাও কেটে যাবে।

বিতান তো একটা জ্বলন্ত সমস্যা নিয়েই বলেছে। যার মোদ্দা কথা, স্কুল কলেজে পড়া শুনা হয় না, তাই দিশেহারা অভিভাবকেরা সেই সব টিচারের কাছেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে পড়ার জন্য পাঠাচ্ছেন। টিচারের প্রাইভেট টিউসন সমাজের এক সমস্যা। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, আমি মাধ্যমিক দিই ১৯৭৬ সালে। স্কুলে বা কলেজে আমার কোনো প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় নি। আমাদের সময়ে টিচাররা খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। অন্তত আমি যে সব স্কুলে পড়েছি, সেই সব স্কুলে খুব ডেডিকেটেড স্যারেদের পেয়েছি। প্রাথমিক পড়েছি আমার গ্রামের পাঠশালায়, মাধ্যমিক বেলমুড়ি ইনস্টিটিউশানে, উচ্চ মাধ্যমিক কলকাতার এস এন কলেজিয়েটে। স্কুল জীবনের টিচাররা আমার কাছে পিতৃতুল্য। তবে, তখন, পড়া না করে স্কুলে তখন স্যারেদের হাতে এমন মার খেতে হতো যে সারা জীবনে তা মনে আছে।

বোধ হয় এরও প্রয়োজন ছিল।

রাজা দেবরায় অল্প কথায় নারীর উপর পরিবারে, সমাজে, abanchhito আচরণ নিয়ে লিখেছে। শুধু পরিবার নারীকে বালা চুড়ি কান ফোঁটানো, নাক বিঁধিয়ে, বাড়ির মাঝে বদ্ধ করাই নয়, নারীকে মানুষ ভাবতেই বাধা দেয়। তেমনি, শিক্ষা বোর্ডও রেজাল্টের ক্ষেত্রে " মেয়েদের মধ্যে প্রথম" দাগিয়ে দিতেও কসুর করে না।

সাহেব ইসলাম নানান গ্রন্থ থেকে দেখিয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম আসলে বিভিন্ন ব্যাবসায়িক ক্ষেত্র। বেদের আগুন মন্ত্র বা কুর আনের ময়দা আয়াত সবই এক হলেও আমার দধিটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

আর, চেতনায় এবারে, কবিতাগুলো ফাটাফাটি।

বিমুক্তির সমঝোতা আমার দারুণ লেগেছে।

রাষ্ট্র যন্ত্র নোটের আঘাতও সহ্য করে না। পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

রুদানের লেখা তো আগাগোড়াই একটা লেভেলের। ওর পোষ্টগুলি পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকি। তাই দাবীর স্লোগানে মুখোশ খোলার আহ্বানে অবশ্যই আমরা সাড়া দিতে চাই। '২১ এর নির্বাচনে অবশ্যই খেয়াল থাকবে।

জামাল আনসারী দুটি কবিতা উপহার দিয়েছেন। প্রথমটি দুটি ফুলের কবিতা, যারা আসলে আমাদের fool ভাবে, এপ্রিল ফুল করে। শুভায়ূ তো তাদের মুখোশ খুলতেই লিখেছে।

অপরটি তাবিজ মাদুলি নিয়ে। জ্বলন্ত সমস্যা সাপে কাটা নিয়ে। আচ্ছা স্কুলের সিলেবাসেও কেন এমন কবিতা রাখেনা।

প্রদীপ চক্রবর্ত্তীর কবিতাটি জীবনের গান, জীবনের ভাষা। মেহেনতি মানুষ কী চায়? একটু খেয়ে প'রে বাঁচতে। একটু শিখতে। একটু চিকিৎসা, একটু মাথার উপর ছাদ। এর জন্য চাই শোষণহীন সমাজ। কিন্তু কেউ কাউকে পথ ছাড়ে না। তাই কৃষক বেচেছেন কাস্তে, শ্রমিক বেচেছেন হাতুড়ি।

আগামী প্রজন্ম মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

এ আন্দোলন বৃথা যাবে না, যেতে পারেনা।

'চেতনা' আনবে চেতনা।

চেতনা পত্রিকার মে সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। যুক্তির পথে আমরা। ধন্যবাদ।

-যুক্তিবাদীরা-